ভেতরে

সংবাদ মাধ্যমকে ... মুক্ত করতে হবে ... ২
পার্টি কর্মী হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ... ৩
রাজ্যের প্রিয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ৫
লোকসভা নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সনদ ... ৬
কৃষকরা দাবি করছে ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৯ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৭ মার্চ ২০১৪

নীতি বদলাও, রাজ বদলাও, সংসদে জনগণের আওয়াজ ওঠাও

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম এল)-এর আবেদন

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এমন একটা সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দেশ এক তীব্র সংকটের মধ্যে। দু-দশক ধরে চলা কর্পোরেটপন্থী, জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার, বেকারির সৃষ্টি করেছে, বহু কৃষককে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে এবং কর্পোরেশনগুলোকে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে বড়-বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলো ঘটেছে এবং দরিদ্রদের উৎখাত হতে হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, আবাসন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জনগণের নাগালের বাইরে চলে গেছে, আর সরকার জনগণের প্রতি তার দায়িত্বকে ঝেড়ে ফেলে তাদের ঠেলে দিয়েছে বাজারের হাতে, যে বাজারে কর্তৃত্ব চালায় কর্পোরেট। জনগণের আন্দোলনকে তীব্র দমনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, আর সাম্প্রদায়িক ও জাতপাত-ভিত্তিক গণহত্যার সংঘটকদের কোন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা থেকে নারীর বঞ্চনা অব্যাহত। প্রতিটি ফ্রন্টেই জনগণকে তাদের বুনিয়াদি স্বার্থ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সেগুলোকে খর্ব করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির জন্য পরপর দু-বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারই সরাসরি দায়ী। সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ২০০৪ সালে এবং পরে আবার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে, কিন্তু বাস্তবে তারা ঠিক উল্টোটাই করে। কংগ্রেসের দুর্নীতিপরায়ণ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য জনগণ মুখিয়ে আছেন, আর সেই শূন্যস্থানে ঢুকে পড়তে বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৯৮-২০০৪ পর্বে কেন্দ্রে তার শাসন-ধারা এবং যে সমস্ত রাজ্যে সে ক্ষমতায় থেকেছে—তা সে এক দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে শাসন করা গুজরাট ও ছত্তিশগড় হোক, বা অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও ক্ষমতায় থাকা বিহার ও ঝাড়খণ্ডই হোক—সেখানে তার শাসন-ধারা বিচার করলে কংগ্রেসের স্থানে বিজেপিকে বেছে নেওয়াটা তপ্ত কড়াই থেকে গনগনে আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ার সামিল হবে।

এটা স্মরণ করা জরুরী যে, ২০০৪ সালে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-র অভাবিত

চারের পাতায় দেখুন

ধুবুলিয়ায় তৃণমূলের হাতে সি পি আই (এম এল) কৃষক কর্মী খুন জনগণের জবাব পাবে নির্বাচনে

কৃষ্ণনগর লোকসভার অধীন ধুবুলিয়া ব্লকের চরমহৎপুরে গত ২১ মার্চ বিকাল নাগাদ সশস্ত্র তৃণমূলী গুণ্ডার দল মাঠে চাষের কাজে থাকা সি পি আই (এম এল) লিবারেশন অনুগামী কৃষকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে, আরও একজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ব্যক্তি সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের একজন সংগ্রামী স্থানীয় কৃষক নেতা, তাঁর নাম ইউসুফ মোল্লা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পার্টি কর্মীর নাম শুকচাঁদ গায়েন। এই ধরণের বর্বর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় কৃষক জনতা ক্ষোভে ফুঁসছেন। সি পি আই (এম এল) নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পরের দিনই ২৩ মার্চ ডাক দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া ও চাপড়া ব্লক জুড়ে বন্ধ-এর। একই সাথে পার্টির রাজ্য কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলায় জেলায় সংঘটিত হয় ধিক্কার দিবস। চলে বিক্ষোভ মিছিল, শ্লোগান, পথ অবরোধ ও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানোর কর্মসূচী।

চরমহৎপুরে তৃণমূলী শয়তানেরা যেদিন আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়, সেদিনই কৃষ্ণনগর শহরে বসে তৃণমূলনেত্রী কর্মীসভা করেছেন। সেই সভায় তিনি একথা বলে গলাবাজী করতে ছাড়েননি যে 'আমরা (তৃণমূল) খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস

শিলিগুড়ির পথে বিক্ষোভ মিছিল। সামনের সারিতে নেতৃবৃন্দ অভিজিৎ মজুমদার, গৌরী দে প্রমুখ।

করি না'। খুনের রাজনীতির কারবারি দলের নেত্রীর বড় গলা। আসলে সেদিন চরমহৎপুরে তৃণমূল বাহিনীর যে সুপরিকল্পিত আক্রমণ নামবে তাকে বাকতাল্লায় আড়াল দিতেই নেত্রী 'খুনে অবিশ্বাসী'র কথা শুনিয়েছেন। এই খুনখারাবির রাজনীতির আরেক পাণ্ডা হল তৃণমূলের এক মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, যে কীনা আন্দোলন করে দখল করা জমির অধিকার থেকে সংগ্রামী কৃষকদের উচ্ছেদ করতে দালালের ভূমিকায় নেমেছে এবং গুণ্ডাবাহিনীকে ব্যবহার করছে।

ধুবুলিয়ার চরমহৎপুরে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন কৃষক কর্মীদের উপর এই আক্রমণ শুধু জমির প্রশ্নে নয়, পরন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরিস্থিতিকে সন্ত্রাসের রাজনীতি চালিয়ে একচেটিয়া সন্ত্রস্ত করে তুলতেও। সি পি আই (এম এল) লিবারেশনকে তৃণমূল নিশানা করছে তার কারণ, এই সংগ্রামী বামপন্থী দলটি ঐ অঞ্চলে জলঙ্গী নদীর চরে পুকুরিয়া ও চরমহৎপুরে জেগে ওঠা জমির ওপর কৃষকদের অধিকার কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে লাগাতার, দ্বিতীয়ত স্থানীয় নপাড়া-২ পঞ্চায়েতে জনগণ এদেরকেই নির্বাচিত করে ক্ষমতায় এনেছে, আর এই কৃষক আন্দোলন ও জনগণের সংগ্রামী বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর ভর করেই সি পি আই (এম এল) লিবারেশন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, প্রার্থী হয়েছেন পার্টির জেলা সম্পাদক সুবিমল সেনগুপ্ত, আর চরমহৎপুর তথা ধুবুলিয়া এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। এই হিম্মৎকে তৃণমূল ঠিক সহ্য করতে চাইছে না। সেই কারণেই খুনের রাজনীতি চালিয়ে দমিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু ওদের খুনের রাজনীতি ওদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন প্রতিবাদ সংগঠিত করে জনসহানুভূতি সমর্থন পাওয়ার উপযুক্ত ভূমিকায় দৃঢ় থাকছে।

চরমহৎপুরের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল কৃষ্ণনগর শহরে সাংবাদিক সম্মেলনে তীব্রভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধতায় সোচ্চার হন। তিনি বলেন, ধুবুলিয়া ব্লকের অধীন নপাড়া-২ পঞ্চায়েতে রয়েছে সি পি আই (এম এল), চরমহৎপুরেও পার্টির পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। তাই এখানে দাঁত ফোঁটাতে না পেরে দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের দলবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কার্তিক পাল আরও বলেন, কৃষ্ণনগর শহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মীসভা হওয়ার পরই এই খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তৃণমূল রাজত্বে রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। তা যদি থাকত তাহলে 'অনুব্রত বাহিনী' গ্রেপ্তার হোত।

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, চরমহৎপুর গ্রামে তৃণমূল মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা

তিনের পাতায় দেখুন

সংবাদ মাধ্যমকে রাজনৈতিক দল ও কর্পোরেট আঁতাত থেকে মুক্ত করতে হবে

লোকসভা ভোটের আগে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নগুলোকে কোনও মতেই মুছে দেওয়া যাবে না। তার যথাযথ উত্তর দিতেই হবে।

যে কোনও গণতন্ত্রের জন্য এমন এক সংবাদ মাধ্যম খুবই জরুরী যা হবে বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন। এখন প্রশ্নটা হল 'স্বাধীন' বলতে কি বুঝব আমরা? সংবাদ মাধ্যম সেন্সরশিপের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে শুধু এটুকুই কি এই স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট বা শাসক দলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তা না থাকলেই কি তাকে স্বাধীন বলতে হবে? নিয়ন্ত্রণের অন্য কোনও পদ্ধতি কি নেই? ভারতের বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমের মালিক যখন কোনও না কোনও কর্পোরেট সংস্থা, তখন কি ছাপা বা বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম তাদের মালিকদের আর্থিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ নিরপেক্ষ থাকতে পারে?

সংবাদ মাধ্যম নামটি দ্বারা আক্ষরিকভাবে যা বোঝায়, সারা পৃথিবী জুড়েই তার মধ্যে আর আজকের দিনের সংবাদ মাধ্যম সীমাবদ্ধ নেই। সংবাদ মাধ্যম এখন শুধু খবর যোগানো আর বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সে এখন সম্মতি উৎপাদনের কারখানাতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক মতামতকে নির্দিষ্ট আদল দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা এখন তার করায়ত্ত। সংবাদ মাধ্যমেই ঠিক করে দেয় কোন বিষয়টি জাতীয় স্তরে গুরুত্ব পাবে, কোন মতামতটি জনমনকে আকর্ষণ করবে। সংবাদ মাধ্যমের এই প্রবল প্রতাপকে দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ রাখার ক্ষমতা যে সামান্যই, সে সম্পর্কিত নানা দৃষ্টান্তও আমাদের হাতের সামনে আছে।

উদারনীতির জমানায় ভারতের সংবাদ মাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতার বিষয়টিই ধরা যাক। ১৯৯০ সালের আগে ভারতে কেবল একটিই টিভি চ্যানেল ছিল, আর সেটি ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। তার নিরপেক্ষতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চলত বহুরকম ঠাট্টা তামাশা। সে সময় ডি ডি নিউজ শাসক দল ও সরকারের হয়েই কথা বলত এবং এই সরকারি চ্যানেলে কখনই কোনও দুর্নীতিকে উন্মোচিত করে দেওয়া হত না বা সরকারের ভুল নিয়ে তদন্ত করা হত না।

মুক্ত সংবাদ মাধ্যমের যুগে যখন অগণিত বেসরকারি চ্যানেল নিজেদের দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে, তখন কি ব্যাপারটা খুব আলাদা রকমের কিছু হয়েছে? চ্যানেলের পর চ্যানেল জুড়ে, খবরের পর খবরের কাগজ জুড়ে আমরা কিন্তু প্রায় একই খবর পড়ে যাই, একই মুখ দেখে যাই। বৈচিত্র এবং তর্কের পরিবর্তে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে পাই একঘেয়েমি এবং সমসত্ততা। ভিন্ন মতামতের জায়গা সেখানে বেশ কমই। অনেকটা সেই পুরনো ডি ডি নিউজ-এর যুগের মতোই আমরা নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তৃতাই বারবার দেখে যাই, শুনতে থাকি উপস্থাপকের একমুখী ভাষ্য।

প্রিন্ট মিডিয়াও একই অসুখে ভুগছে। সেটা লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীর প্রচার বিবরণই হোক বা প্রথম দিকে বিহারে নীতীশ সরকারের বা ছত্তিশগড়ে রমণ সিং সরকারের গুণকীর্তন হোক। বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার অভাবের দিকটি কি প্রিন্ট মিডিয়া কি বৈদ্যুতিন মিডিয়া, সবার ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট।

এই একদেশদর্শিতা আরও নানাভাবেই দৃশ্যমান। দিল্লীর গণধর্ষণ মিডিয়াতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেল, কিন্তু কাশ্মীরের কুনান পোশপোরাতে হেফাজতের ভেতরের ধর্ষণ বা মণিপুরে থাংজাম মনোরমার ধর্ষণের ন্যায়বিচারের দাবি বা তা না মেলা নিয়ে কোনও আলোড়ন হল না। বিহারে রণবীর সেনার গণহত্যাগুলোর অভিযুক্তরা পরের পর রায়ে ছাড়া পেল। সেই ছাড়া পাওয়ার কলঙ্কিত ঘটনাগুলোও জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে তেমনভাবে এলোই না।

একদেশদর্শী উপস্থাপন নিয়ে আম আদমি পার্টির আক্রমণাত্মক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বৈদ্যুতিন চ্যানেল দুর্নীতি ও একদেশদর্শীতার বিষয়ে প্রমাণ চেয়েছে। রাডিয়া টেপ আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে কর্পোরেট জগৎ কীভাবে মিডিয়া ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, আর সেই টেপ যে হিমশৈলের চূড়া মাত্র সেটাও আমরা বুঝতে পারি। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের ধরণ ধারণের ঢং এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু লাগে নাকি? এমনকী কোনও কোনও চ্যানেলের দোল/হোলি উৎসবের উপস্থাপনও কার্যত মোদী প্রচারে পর্যবসিত হয়েছিল।

স্নুপগেট টেপ দেখিয়ে দিয়েছে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদী কীভাবে আইন অমান্য করে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগকে এক তরুণীর ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারির পেছনে লাগিয়েছিলেন। এটা বোঝা সত্যি দুষ্কর কোনও সংবাদপত্র, চ্যানেল বা কোনও নিউজ অ্যাঙ্কর, তা তিনি যতই আক্রমণাত্মক হোন না কেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর কাছে এই বিষয়ে জবাব চাইছেন না কেন? বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই খবরের মানদণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই বাজারেও এই বজ্রগর্ভ বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার এক আশ্চর্য সমঝোতাপূর্ণ আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে।

প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন আমাদের একদিকে শোনাচ্ছে এই নির্বাচন আসলে ব্যক্তিত্বের লড়াই, তখন আশ্চর্যজনকভাবে কোনও সংবাদ মাধ্যমেই বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর কোনও সাক্ষাৎকার দেখা যাচ্ছে না। এই পর্বে একটি মাত্র সাক্ষাৎকারই তার পাওয়া গিয়েছে, যেটি নিয়েছিলেন রয়টার্সের সাংবাদিক আর তিনিও তাকে কোনও কঠিন প্রশ্ন করেননি। বাম নেতারা রিলায়েন্সের গ্যাসের মূল্য সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে বহুদিন আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ মিডিয়াই হয় সেটিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, বা উপেক্ষা করেছে। এই ধরণের নীরবতার ঘটনার মত নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ আর কি হতে পারে?

পয়সার বিনিময়ে খবর করার অনেক দৃষ্টান্তই সামনে এসেছে। তার মধ্যে সংবাদ মাধ্যমই কয়েকটির পর্দা ফাঁস করেছে। ঘটনাগুলো সামনে আসার পর বোঝা গেছে সংবাদ মাধ্যমের হাত কত লম্বা। আর এখান থেকেই সংবাদ মাধ্যমের শেয়ারের তথ্যাবলী জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসা বা তার বিভিন্ন চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আনার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জোরালো হয়েছে।

তবে কেজরিওয়ালের সংবাদ মাধ্যমের একদেশদর্শী ও পয়সার বিনিময়ে খবর করার অভিযোগটি নিয়ে কিছু সমালোচনা ন্যায্যই। সমস্যা এটা নয় যে তিনি পয়সার বিনিময়ে খবর করার বিষয়টি সামনে এনেছেন। তার সাংবাদিকদের জেলে পোরার হুমকিটিই সমস্যাজনক আর এর মধ্য দিয়ে তার ঔদ্ধত্য আর কপটতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তখনই সংবাদ মাধ্যমের একদেশদর্শীতা নিয়ে অভিযোগ তুললেন যখন তাদের পক্ষপাতিত্ব বিজেপির দিকে হেলে পড়েছে। আন্না হাজারের যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ সংক্রান্ত সময়ে যখন মিডিয়া ২৪ ঘন্টা ৭ দিন তা প্রচার করেছিল, তখন কোনও পক্ষপাতিত্বের কথা তার মাথায় আসেনি। তখন সংবাদ মাধ্যম ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্যকারের চেয়ে অনেক বেশি ভূমিকা নিয়ে কিন্তু এর প্রত্যক্ষ অংশীদার হয়ে পড়েছিল।

সবচেয়ে বড় কথা সম্প্রতি সামনে আসা সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষাৎকার বিরতিকালীন এক ভিডিও চিত্রতে তাকে দেখা গেছে। সেখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিককে তিনি অনুরোধ করছেন আর্থিক নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন না করার জন্য। বোঝা গেছে তিনি কীভাবে সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে তার নিজের একটা ভাবমূর্তি তৈরির জন্য সাক্ষাৎকারের চরিত্র বা বিষয়বস্তু নির্ধারণের চেষ্টা করেন। কেজরিওয়াল সেই ভিডিও চিত্রতে সাংবাদিককে অনুরোধ করেন যেন কর্পোরেট জগতের দুর্নীতি বা বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে প্রশ্ন না করা হয়, কারণ তাহলে মধ্যবিত্ত তাদের থেকে দূরে সরে যেতে পারে। ভগৎ সিং-এর একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ছবি তোলান এবং বলেন ভগৎ সিং সংক্রান্ত তার সাক্ষাৎকারের মন্তব্যের অংশটিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে, যাতে তাকে বিপ্লবী বলে মনে হয়। এটা কি রাডিয়া টেপের থেকে খুব আলাদা কিছু যেখানে আমরা দেখেছিলাম উপস্থাপক আর কলমচি কর্পোরেট প্রতিনিধির থেকে কোন ইস্যুকে কীভাবে তোলা হবে সেই বিষয়ে নির্দেশনামা নিচ্ছেন।

সারা পৃথিবী জুড়েই কর্পোরেট মিডিয়ার কর্পোরেট জগতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশিত হয়ে গেছে। ব্রিটেনে মারডক কলঙ্ক বা ভারতে রাডিয়া টেপের উদঘাটন সংবাদ মাধ্যমের ওপর কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ সংক্রান্ত কিছু মাইল ফলক বলে গণ্য হতে পারে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কেবল রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থেমে থাকতে পারে না। নির্বাচিত সংস্থা, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনগুলোকে কর্পোরেট আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্য অবশ্যই লড়াই করা দরকার। ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর মতো সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কেও জনগণ সংশয়ী হয়ে উঠেছেন। ক্রমশই সংবাদ মাধ্যমের পক্ষপাত বিষয়ে তারা সতর্ক হচ্ছেন আর তাকে উন্মোচিত করে দিচ্ছেন।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৯ মার্চ ২০১৪)

সম্পাদকীয়

চলছে রঙ্গ, ঝরছে রক্ত

লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজছে। বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ কতকিছুই না দেখছে! চমক, ধমক, ধ্যাষ্টামো কোনকিছুরই যেন মাত্রা নেই। মওকা বুঝে ফায়দা তুলতে ময়দানে নেমে পড়েছে ক্ষমতাধর শক্তিগুলো। শাসকশ্রেণীর দালাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে কর্পোরেট পুঁজি, কর্পোরেট মিডিয়া, বাণিজ্যিক বিশ্লেষক সংস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতের দল, শেয়ার বাজার, কালো টাকার কুবের শক্তি, এরা সব নেমে পড়েছে যে যার ধান্দায়। নামিয়ে দেওয়া হয়েছে পর্দার-মঞ্চের জগতের নবীন-প্রবীণদের। কতরকমের 'আনুগত্য বদলের' খেল কসরত শুরু হয়ে গেছে। বাজী ধরা হচ্ছে সবকিছুতে, সবকিছুকেই। সারদার হাতানো টাকা কিংবা বেলুড় মঠের মা সারদার প্রসাদ, কোনোকিছুই ছাড়াছাড়ি নেই। ঠাহর হচ্ছে কত রঙ্গে মত্ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই বঙ্গভূমি। না, বাকী ভারতের তথ্যচিত্রও রঙ্গ-মুক্ত নয়। তবু বাংলার পরিস্থিতি বিশেষ নজর টানছে। কারণ কেন্দ্রে এবার 'বিকল্প' কায়েম হওয়ার সমস্তরকমের ম্যাজিক চাবিকাঠি রয়েছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝোলায়! রাজনীতির 'দিদি'র দাবি সেটাই। তাই এ রাজ্যের নির্বাচনী রণরঙ্গ তো বিশেষ বুঝে নেওয়ারই।

তবে শুধু রঙ্গ প্রদর্শিত হচ্ছে না নয়, রক্তও ঝরছে। শাসকদলের একচেটিয়া দুর্বৃত্তায়ন চলছে। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে 'দেখে নেওয়া হবে'। নির্বাচন কমিশনকে তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। পুলিশ-প্রশাসন রাজ্যের শাসকদলের পকেটে। খোদ একমোবদ্বিতীয়ম নেত্রীর মুখে সর্বগ্রাসী হুঙ্কার। দলের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রার্থী পুনর্নির্বাচিত হওয়া নিয়ে শঙ্কার জেরে ভদ্দরলোকীপনার মুখোশ খুলে ফেলে আরাবুল স্টাইলে রিগিং-এর ফতোয়া শোনাচ্ছেন। শাসকদলের সিনেমার হিরো প্রার্থী তাঁর রমণী মোহন জনপ্রিয়তা উপভোগ করাটা প্রকাশ করছেন নারী ধর্ষণের পরিস্থিতির সমতুল অনুভূতি উপমা হিসেবে উল্লেখ করে! 'রংবাজ' নায়ক দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে দাঁড় করানো দিদি-দাদাদের পদাঙ্ক কেমন অনুসরণ করছেন। অবিলম্বে অবশ্য তীব্র ধিক্কারের ধাক্কায় 'ক্ষমাপ্রার্থী' হয়েছেন। এরা গলাবাজী করছেন, 'দেশের-দশের' প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নেবেন। আসলে এরা 'দিদি'-র জমানার আশীর্বাদ ধন্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। সাফল্যের সাতকাহন আর প্রতিশ্রুতির ফলঝুরির কোন অভাব রাখা হচ্ছে না। বসন্তের কোকিলদের ভীড় এখন কংগ্রেস-বিজেপিতে শুধু নয়, সবচেয়ে বেশী তৃণমূল কংগ্রেসে।

তবে শুধু রণরঙ্গ চলছে না। রক্তও ঝরছে। যারা সাচ্চা বিরুদ্ধতার হিম্মৎ দেখাতে চাইছেন তাদের ওপর হামলা হচ্ছে। শাসকদলের হামলা। জমির অধিকার কায়েম করার আন্দোলনের দরিদ্র কৃষককে জমির ওপরেই হত্যা করা হচ্ছে। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এসে এখন সেই জমি পাওয়ার প্রশ্নে আইন-আদালতের জটিলতায় ফাঁসিয়ে রাখা হয়েছে। আর আজ যারা নতুন করে জমির আন্দোলন করতে চাইছে তাদের ওপর নামছে দমনপীড়ন। নদীয়ার চরমহৎপুরে এসবই ঘটছে। আজ সে হত্যাকাণ্ড ঘটছে চরমহৎপুরে আগামী দিনে সেই বিপদবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকছে ষোল আনা। শুধু জমির প্রশ্নে নয়, জনজীবনের কোন ক্ষেত্রেই শাসকের জনবিরোধী চেহারার বিরোধিতা করার গণতন্ত্রের 'গ' বরদাস্ত করা হচ্ছে না। গণতন্ত্রের গঙ্গাযাত্রা করে দেওয়া হচ্ছে।

এরই মধ্যে কেন্দ্র-রাজ্যের চাপান উতোর চালিয়ে আসর জমাতে মেতে উঠছেন দুই শাসকের দুই প্রতিনিধি। একজন কেন্দ্রের ও কংগ্রেসের রোল মডেল যুবরাজ, অন্যজন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। একজন দুর্নীতিবাজ কেলেঙ্কারীর দল ও সরকারের হবু কর্ণধার, অন্যজনও জড়িয়েছেন নানা দুর্নীতিতে—উপরন্তু জন্ম দিচ্ছেন জিজ্ঞাসার—স্বৈরতন্ত্র কায়েমের পথে? একজন কেন্দ্রে পরিবারতন্ত্র কায়েমের আজকের উত্তরসূরী হতে উন্মুখ, অন্যজনও পরিবারতন্ত্র কায়েমের কাজে হাত দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে যুবরাজের হাতে, রাজ্যে তৈরী করা হচ্ছে তৃণমূলের 'যুবা' নেতা। অথচ দমনতন্ত্র-দলতন্ত্র চালানোর বৈচিত্রের মধ্যেও এদের মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত ঐকমত্য! দেশকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে যে কর্পোরেটমুখী আর্থিক নীতি, সেকথা এরা চেপে রাখছে। এরা আবার দেশের ঠিকেদারী চায়!

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

ধুবুলিয়ায় তৃণমূলের হাতে পার্টি কর্মীর হত্যার বিরুদ্ধে কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, হুগলীতে বিক্ষোভ

গত ২০ মার্চ নদীয়ার ধুবুলিয়া ব্লকের অধীন চরমহৎপুরে তৃণমূলী গুণ্ডাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণে নিহত শহীদ কমরেড ইউসুফ মোল্লার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও মমতা ব্যানার্জীর সরকারের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস নামিয়ে এনে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করা ও প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে যে ধিক্কার দিবস পালনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তারই অঙ্গ হিসাবে গত ২২ মার্চ কলকাতায়—যাদবপুর পালবাজার, ঢাকুরিয়ায় পার্টি অফিসে, বেহলার কালীতলা ও মুচিপাড়ার মোড়ে এবং কলেজ স্কোয়ারে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। মৌলালীতে রাজ্য অফিসের পাশে জেলা কমিটির উদ্যোগে শহীদ কমরেড ইউসুফ মোল্লার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়তু দেশমুখ; পার্টির জেলা কমিটির সদস্য রণজয় সেনগুপ্ত, চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী; দেশব্রতী পত্রিকার অরূপ পাল; পার্টি অফিসের দায়িত্বশীল সুরেশ মণ্ডল; কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মাল্যদানের পরে শহীদ কমরেডের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করে কর্মসূচী শেষ হয়।

দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে এ আই এস এ (আইসা)-র উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কলেজ স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে শেষ করে।

পাশাপাশি কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে মৌলালীর মোড়ে জমায়েত হয়ে পথ অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলে। অবরোধ চলাকালীন জনগণের উদ্দেশ্যে পার্টি কর্মীদের উদ্দীপ্ত শ্লোগান ও প্রতিরোধের আহ্বান রাখা হয়। অবরোধের সময় রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জয়তু দেশমুখ জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে জনগণকে এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। অবরোধ শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কুশপুতুল পোড়ানোর মধ্য দিয়ে অবরোধের কর্মসূচী শেষ হয়।

বেহালা অঞ্চলে সন্ধ্যায় লোকাল কমিটির উদ্যোগে এই হত্যার বিরুদ্ধে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ও জনগণকে তৃণমূলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান রেখে একটি সাইকেল মিছিল পূর্ব বেহালা জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চরমহৎপুর অঞ্চলে তৃণমূলী গুণ্ডাদের সশস্ত্র হামলায় নিহত কৃষক নেতা কমরেড ইউসুফ মোল্লার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে খুনীদের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ২২ মার্চ শিলিগুড়িতে একটি ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে স্থানীয় হাসমি চকে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটি সদস্য পবিত্র সিং, গৌরী দে, মোজাম্মেল হক, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, ছাত্র নেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী, নেত্রী মীরা চতুর্বেদী প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ধর্মপুর অঞ্চলের খাদ্দির মাঠে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ২৫ মার্চ মশাল মিছিল সংগঠিত করা হয়। নেতৃত্ব দেন পার্টির জেলা কমিটি সদস্য শ্যামল ভৌমিক, অন্নদেব রায়, রবিনাথ রায় প্রমুখ।

২২ মার্চ চুচুড়ায় লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্রের সি পি আই (এম এল) প্রার্থী সজল অধিকারীর সমর্থনে জেলা কর্মীসভা ছিল। সভায় রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ এবারের নির্বাচনে আমাদের সংগ্রামের ও প্রচারের মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন। দেশজোড়া দুর্নীতি, কর্পোরেট লুঠ এবং পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা ঘটে চলা নারী নির্যাতন, টেট ও সারদা দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান গণ আন্দোলনের সাথে নির্বাচনী লড়াইকে যুক্ত করার কথা বলেন। বক্তব্য রাখেন প্রার্থী সজল অধিকারী। প্রচারের প্রাথমিক কাজ যেগুলো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী কাজের পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন এলাকার সংগঠকরা তাদের মতামত জানান। জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার একপ্রস্থ নির্বাচনী কর্মসূচী কর্মীবাহিনীর সামনে হাজির করেন। সভার শেষে পার্থ ঘোষ, প্রবীর হালদার, সজল অধিকারীর নেতৃত্বে এক ধিক্কার মিছিল চুচুড়া শহর পরিক্রমা করে ধুবুলিয়ায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের হাতে নিহত কমরেড ইউসুফ মোল্লার হত্যার প্রতিবাদে।

চুঁচুড়াতে বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলের সামনে রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, হুগলী জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

... জনগণের জবাব পাবে নির্বাচনে

একের পাতার পর

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কর্মী ইউসুফ মোল্লাকে গুলি করে হত্যা করে এবং বেশ কয়েকজন কর্মীকে গুরুতরভাবে আহত করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে 'কৃষিজমি রক্ষা'র আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন তৃণমূল এখন কৃষক উচ্ছেদ ও কৃষক হত্যাকারীদের মদত দিচ্ছে।

রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গ্রামীণ ধনীরা দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করে আসা ঐ এলাকার গরিব চাষিদের উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু করেছে। এই উচ্ছেদের অঙ্গ হিসাবেই পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নামানো হয়েছে। জমি রক্ষা আন্দোলন এবং অন্যান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সি পি আই (এম এল) ঐ অঞ্চলে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করে, প্রধান নির্বাচিত হয়। ব্যাপক বামপন্থী কর্মীরা সি পি আই (এম)-এর সুবিধাবাদী ও আপোষকামী নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনে যোগদান করতে থাকে। সংগ্রামী বামপন্থী শক্তির এই জাগরণে আতঙ্কিত হয়ে তৃণমূল এলাকায় কৃষক উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে এবং গরিব কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতের কাজে বাধা দিতে শুরু করে। সমাজবিরোধীদের আশ্রয় করে সি পি আই (এম এল)-এর কর্মীদের উপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে গণতন্ত্রের উপর হামলা নামিয়ে আনে।

তৃণমূলনেত্রী কালীঘাটের বাড়ীতে ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্তাহার প্রকাশ করে দাবি করেছেন তাঁরা 'কৃষক ও পরিবেশবান্ধব জমি নীতি অনুসরণ', 'সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের' সপক্ষে! আর প্রকৃত নির্মম বাস্তবতা হল, তৃণমূল বাহিনীর হাতে জমি আন্দোলনের কৃষকদের, সংখ্যালঘুদের হত্যাকাণ্ড ঘটছে। চরমহৎপুর কাণ্ডে এটাই প্রমাণিত হল আরেকবার। এর মাশুল তৃণমূলকে লোকসভা নির্বাচনে দিতেই হবে।

বজবজে শ্রমিকদের প্রতিবাদী মিছিল

গত ২০ মার্চ নিউ সেন্ট্রাল জুটমিলের শ্রমিকরা কারখানার ঝাণ্ডাপার্ক থেকে চড়িয়াল মসজিদতলা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করে।

গত ১৪ মার্চ শ্রমিক কনভেনশন হওয়ার পর ম্যানেজমেন্ট শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবার জন্য শ্রমিক মঞ্চের একজন নেতাকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া ও অন্যান্য নেতাদের নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি করার হুমকী দেয়। শ্রমিক ও নেতাদের জঙ্গী প্রতিবাদের সামনে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া নেতাকে কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস করেনি ম্যানেজমেন্ট।

ম্যানেজমেন্টের নানারকম হুমকী উপেক্ষা করে নিজেদের দাবি জোরের সাথে তুলে ধরার জন্য শ্রমিক সুরক্ষা মঞ্চ এক মিছিলের আহ্বান করেন। উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুই শতাধিক শ্রমিক মিছিলে পা মেলায়। নেতৃত্ব দেন মঞ্চের আহ্বায়ক বিপ্লব দেবনাথ ও লক্ষ্মী অধিকারী, তিলক পাল, ব্রীজমোহন, সবিফুল, এ আই সি সি টি ইউ জেলা সভাপতি কিশোর সরকার। মিছিলে আওয়াজ ওঠে ম্যানেজমেন্টের জুলুমবাজি বন্ধ করো। মিথ্যা অজুহাতে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া সমস্ত শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা কেটে পি এফ, পেনশন ফাণ্ডে জমা পড়ছে না কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও; অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত শ্রমিকদের পি এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা পরিশোধ করতে হবে; জুট শিল্পভিত্তিক মজুরি চালু করতে হবে, শ্রমিকদের পদোন্নতি করতে হবে, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সমস্ত শ্রমিক এক হও।

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর মোকাবিলায় ঝাড়খণ্ডে জনবিকল্প জনসমাবেশ

সি পি আই (এম এল)-এর রামগড়, হাজারিবাগ জেলা কমিটির নেতৃত্বে রামগড়ের প্রখণ্ড ময়দানে এক জনবিকল্প জনসমাবেশ সংগঠিত হয়। কর্পোরেট ফ্যাসিবাদ, লুণ্ঠন ও দুর্নীতির বিরোধিতায় এবং উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের দাবিতেই সংগঠিত হয় ঐ সমাবেশ। নই সরাইয়ের মাইনস রেস্কিউ ভবন থেকে মিছিল শুরু হয় এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে দরিদ্র জনগণ শ্রমিক, কৃষক ও নারীরা বিপুল সংখ্যায় মিছিলে যোগ দেন। ৩৩ নং জাতীয় সড়ক ধরে মিছিল তিন কিলোমিটার চলে এবং মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে—''খেতি, খাঞ্জি আউর রোজগার, লড়কে লেঙ্গে হর অধিকার'', ''করে ঘোটালা আউর জনসংহার, ও হি হ্যায় পি এমকে দাবিদার'' এবং ''মাহিঙ্গাই আউর ভ্রষ্টাচার, কংগ্রেস ও ভাজপা দোনো জিম্মাদার''। এইভাবে মিছিল পৌঁছায় প্রখণ্ড ময়দানে এবং জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটি সদস্য কমরেড সোহারি কিস্কু এবং সভা পরিচালনা করেন রায়গড় জেলা সম্পাদক কমরেড ভুবনেশ্বর বেদিয়া।

র‍্যালির আগের দিন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য নির্বাচনী ফায়দা তোলা। রামগড় পরিণত হয় পুলিশী শিবিরে, সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি, পুলিশ ও প্রশাসন সি পি আই (এম এল)-এর জনসমাবেশকে ব্যর্থ করতে উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু জনগণ ১৪৪ ধারাকে অগ্রাহ্য করে দলে দলে র‍্যালিতে যোগ দিয়ে জনসমাবেশকে ব্যাপকভাবে সফল করে তোলেন। এরপর রামগড়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সম্পাদক ভুবনেশ্বর বেদিয়া, জে কে এম এস-এর নেতা দেওকিনন্দন বেদিয়া, এ আই সি সি টি ইউ নেতা বৈজনাথ মিস্ত্রি, জেলা কমিটির সদস্য সরযু মুণ্ডা, আর ওয়াই এ নেতা অমল ঘোষাল, সাংবাদিক জাভেদ ইসলাম এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জনসভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বাগোদরের বিধায়ক বিনোদ সিং, রাজ্য সম্পাদক জনার্দন প্রসাদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনন্ত প্রসাদ গুপ্তা।

জনসভায় কমরেড দীপঙ্কর উপস্থিত জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জনসভায় বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে তাঁরা ঝাড়খণ্ডে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে উসকিয়ে তোলার সাম্প্রদায়িক

আটের পাতায় দেখুন

নীতি বদলাও, রাজ বদলাও, ...

একের পাতার পর

পরাজয়ের পিছনে দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথমত 'ভারত জ্বলজ্বল করছে' বলে এন ডি এ সরকার যে অসার দাবি করেছিল তা নিয়ে জনগণ রুষ্ট ছিলেন, কেননা কৃষকদের আত্মহত্যা, বেড়ে চলা বেকারি, দ্রব্যমূল্যের তীব্র বৃদ্ধি এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে তা এক নিষ্ঠুর তামাশা হয়েই দেখা দিয়েছিল। অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণটা ছিল গুজরাটের গণহত্যা, যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল বিজেপি এবং যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী যিনিই আজ বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীকে বসানোর এই তোড়জোড় শুধু সংঘ পরিবারেরই নয়, সমস্ত বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলোও তাতে সামিল হয়েছে; ঐ উদ্যোগে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও মদত রয়েছে, ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েলের আমেদাবাদ সফর সহ আমেরিকার দেওয়া কিছু সংকেতের মধ্যে দিয়ে যা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সর্বব্যাপী এই সংকট থেকে মুক্তির আশা রয়েছে বিকল্পের জন্য জনগণের সংগ্রামের মধ্যে! তৈরী কোন বিকল্প এখনই নেই; জনগণের লাগাতার গণতান্ত্রিক আত্মঘোষণার মধ্যে দিয়েই তাকে আমাদের তৈরি করতে হবে। আসুন, যে অর্থনৈতিক নীতিমালা আমাদের দুর্নীতি ও দুর্দশা দিয়েছে তাকে পাল্টানোর জন্য ২০১৪-র নির্বাচনে আমরা ভোট দিই; আমাদের অধিকার অর্জন এবং দমনপীড়নের অবসানের লক্ষ্যে ভোট দিই! দুর্নীতিপরায়ণ ও জনবিরোধী শক্তিগুলোকে অপসারিত করতে এবং সত্যিকারের সংগ্রামী শক্তিগুলোকে সংসদে পাঠানোর জন্য ভোট দিই!

পরিবর্তনের জন্য সি পি আই (এম এল)-এর সনদ

সি পি আই (এম এল)-এর রয়েছে পরিবর্তনের জন্য জনগণের সংগ্রামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য এবং আমরা পুনরায় অঙ্গীকার করছি যে সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষে নির্বাচিত সমস্ত সাংসদই পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত সনদকে রূপায়িত করতে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

(১) অর্থনৈতিক নীতিকে পাল্টে জনস্বার্থমুখী করে তোলা ঃ

(ক) এমন একটা নতুন আইন তৈরি করতে হবে যা কৃষি জমিকে রক্ষা করবে এবং বেসরকারি সংস্থার দ্বারা বনজমি, উপকূল অঞ্চল ও প্রথাগতভাবে মাছ ধরার অঞ্চলে সমস্ত ধরণের অধিগ্রহণকে বন্ধ করবে।

(খ) কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগকে বাড়াতে হবে এবং সংকট-জর্জরিত কৃষক জনতাকে সমস্ত ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য দিতে হবে।

(গ) দেশীয় উৎপাদন শিল্পকে শক্তিশালী করে তুলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর ওপর জোর দেওয়া হবে।

(ঘ) খুচরো ব্যবসা এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে কোন ধরণের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া চলবে না, ক্ষতিকর বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে সমস্ত শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলোকে রক্ষা করতে হবে।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ও আর্থিক ক্ষেত্রগুলোর বেসরকারিকরণ বন্ধ করা এবং তেল ও গ্যাস এবং খনিজ সম্পদগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

(চ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

(২) মূল্যবৃদ্ধিকে রোধ করা এবং মেহনতি জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটানো

(ক) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও পরিষেবাগুলোর মূল্যকে এমন মাত্রায় বাড়তে দেওয়া হবে না যা জনগণের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে।

(খ) খাদ্য সুরক্ষা আইনকে শক্তিশালী করে তুলে পাঁচ সদস্যের পরিবারের জন্য প্রতি মাসে চিনি, দুধ, ডাল ও ভোজ্য তেল সহ ৫০ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়াকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ধারাগুলোকে সম্প্রসারিত করে প্রতিদিন ন্যূনতম ৩০০ টাকা মজুরি সহ ২০০ দিনের কাজ পাওয়াকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং পৌরসভা এলাকাগুলোকেও এই আইনের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

(ঘ) বি পি এল নিয়ে যে সমস্ত বেনিয়ম চলছে সেগুলোকে বন্ধ করতে হবে—৫ একরের কম জমি রয়েছে এবং কর দেন না এমন সমস্ত জমির মালিকদেরই বি পি এল বলে গণ্য করে দরিদ্রদের দেয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রাপক করে তুলতে হবে।

(ঙ) জমির ঊর্ধ্বসীমাকে কমিয়ে তার নির্দিষ্ট মান স্থির করতে হবে এবং ভূমি, প্রজাস্বত্ব ও অন্যান্য কৃষক স্বার্থমুখী কৃষি সংস্কারকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করতে এবং কৃষি ও বাগিচা ক্ষেত্রে কর্মরত মেহনতি মানুষদের জন্য বাস্তু জমি পাওয়াকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৩) উন্নয়নের নীতি ও পথকে নতুন ধারায় সূত্রায়িত করে
জনগণের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবং পরিবেশকে সুরক্ষিত করা

(ক) উন্নয়নের নীতি ও পথকে নতুন ধারায় সূত্রায়িত করে বণ্টনমূলক ন্যায়, জনগণের অধিকার ও পরিবেশের সুরক্ষাকে তার তিনটি মূল নীতি করে তুলতে হবে।

(খ) পরিবেশগত বিধির লঙ্ঘনকারী সমস্ত প্রকল্পকে বন্ধ করতে হবে।

(গ) জনগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক পারমাণবিক প্রকল্পগুলোকে এবং জি এম শস্যের চাষকে বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) গ্রাম ও শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ব্যবসা ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) গ্রামে বিদ্যুতায়ন করতে হবে।

(চ) সকলের জন্য ভালো মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৪) সম কাজে সম মজুরি, ঠিকা শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ এবং ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধি

(ক) স্থায়ী চরিত্রের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ করতে হবে, সমস্ত ক্ষেত্রে সম কাজে সম মজুরির নীতিকে বলবৎ করতে হবে, পুরুষ শ্রমিকরা যে মজুরি পান মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সেই মজুরিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও মিড-ডে মিল রন্ধনকর্মীদের যথাযথ বেতন স্কেল সহ নিয়মিত কর্মী হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(গ) ন্যূনতম মজুরি প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা করতে হবে।

(৫) জনগণের অধিকার

(ক) খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার রূপে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) শিক্ষিত বেকার যুবকরা যতদিন না যথাযথ কাজ পায় ততদিন তাদের জন্য প্রতি মাসে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে।

(গ) মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলোকে রূপায়িত করতে হবে।

(৬) দানবীয়, মান্ধাতা আমলের ও জনবিরোধী আইনকে বাতিল করা এবং
সকলের জন্য ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করা

(ক) ইউ এ পি এ, আফস্পা, দেশদ্রোহ আইন ও ৩৭৭ ধারাকে বাতিল করতে হবে।

(খ) অপারেশন গ্রীণ হান্ট ও সালওয়া জুডুমকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং আদিবাসীদের অধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত ইস্যুর অবিলম্বে সমাধান করতে হবে।

(গ) ২০০৫-এর সেজ আইন এবং ২০০৩-এর বিদ্যুৎ আইনকে বাতিল করতে হবে।

(ঘ) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জাতপাত-ভিত্তিক গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জনজাতি হত্যা ও বিচার-বহির্ভূত হত্যার সংঘটকদের শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) তফশিলি জাতি/জনজাতি নিপীড়ন নিবারণ আইনকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং বর্ণবাদ আর সংখ্যালঘু ও পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণকে বন্ধ করতে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(চ) মুসলিম ও আদিবাসী যুবকদের গ্রেপ্তারি ও হয়রানিকে বন্ধ করতে হবে, বিচারকে ত্বরান্বিত করতে এবং বছরের পর বছর জেলে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হবে।

(৭) নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা

(ক) নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ মজুরি সহ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) সমস্ত নারীদের জন্য ঘরে এবং জনস্থলে পরিচ্ছন্ন বাথরুমের ব্যবস্থা করতে এবং নিয়মিত ও নিরাপদ গণ পরিবহনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) হিংসার শিকার হয়ে বেঁচে যাওয়া নারীদের জন্য প্রতিটি পুলিশি জেলায় একক-স্থান ভিত্তিক ২৪ ঘন্টা চালু সংকট কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) ধর্ষণ ও অ্যাসিড আক্রমণের শিকার নারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) লিঙ্গ-সংবেদনশীল পুলিশী ও বিচারধারাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বিচারপতি ও আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি ঘটনার দ্রুত ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে।

(চ) লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিলকে আইনে পরিণত করতে হবে।

(ছ) নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক যে সমস্ত ব্যক্তি নারী-বিরোধী হিংসার অপরাধে যুক্ত, নতুন আচরণ বিধি চালু করে তাদের প্রার্থীপদ খারিজ করতে হবে, লোকসভায় নারী বিদ্বেষী মন্তব্য ও আচরণ বন্ধ করতে এবং রাষ্ট্র/রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তিগুলোর নৈতিক দাদাগিরিকে বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করা হবে না।

(জ) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দীর্ঘদিন ধরে ফয়সালা না হওয়া হেফাজতে ধর্ষণের মামলাগুলোতে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ) বিভিন্ন মহিলা সংগঠন যে নারী-ইস্তাহার প্রকাশ করেছে তাকে নির্ধারিত সময়ে রূপায়িত করতে হবে।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন

(ক) পশ্চাদপদ রাজ্য ও অঞ্চলগুলোকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে এবং সর্বপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

(খ) স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে ও সমাধানের লক্ষ্যে বিবেচনার জন্য দ্বিতীয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করতে হবে।

(গ) সংবিধানের ২৪৪ এ ধারা প্রয়োগ করে কার্বি আংলং ও দিমা হাসাও জেলা দুটিকে স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে।

(৯) নির্বাচনী, আইনী ও পুলিশী সংস্কার

(ক) নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন করতে হবে, কর্পোরেটের অর্থদানকে বন্ধ করতে হবে এবং সমস্ত দল ও প্রতিদ্বন্দ্বি যাতে সম-ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) জন লোকপাল আইন তৈরি করে এক শক্তিশালী ও স্বায়ত্বশাসিত দুর্নীতি-বিরোধী নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করতে হবে এবং সরকারের সমস্ত স্তর, কর্পোরেট সংস্থাগুলো, সশস্ত্র বাহিনী এবং এন জি ও-দের তার আওতায় আনতে হবে।

(গ) পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামের উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ও তদন্ত ব্যুরোকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ করতে হবে এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমস্ত অপারেশনকে সংবিধানের মর্মার্থ এবং আইনি শাসনের মূল নীতিকে অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) কারা বিধিকে আধুনিক করে তুলে কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে, জেলে কয়েদীদের অত্যধিক ভিড় যাতে না হয় তার জন্য জামিনকেই স্বাভাবিক নিয়ম করে তুলতে হবে এবং সাজাপ্রাপ্ত না হয়ে মানুষকে যাতে বছরের পর বছর জেলে পচতে না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(চ) মৃত্যুদণ্ডের বিলোপ ঘটাতে হবে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে শাস্তির সর্বোচ্চ সীমা করতে হবে।

(১০) ভারতের বিদেশ নীতিকে নতুন দিশায় রূপায়িত করা

(ক) ভারতের বিদেশ নীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির স্বার্থ ও অগ্রাধিকার থেকে মুক্ত করতে হবে।

(খ) ছোট ও বড় সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতকে মৈত্রী সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

বন্ধুগণ,

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম এল) প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যাতে সংসদে জনগণের প্রতিরোধের কণ্ঠস্বরকে জোরালোভাবে তুলে ধরা এবং লুণ্ঠন ও দুর্নীতিরাজকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়। কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের পদধ্বনিকে সার্বিকভাবে প্রতিহত করুন এবং সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সর্ব উপায়ে জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

দাম বাঁধো, কাজ দাও, কাজের পুরো মজুরি দাও!
জমানা বদলাও, দুর্নীতি ও লুটের রাজ হঠাও!
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চূর্ণ কর, শান্তি ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত কর!
কৃষি জমি, কৃষি, কৃষক বাঁচাও, কর্পোরেট লুঠের জমানা খতম কর!
নারীদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা দাও!

রাজ্যের প্রিয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আমাদের আবেদন ও দাবিসনদ

গণতন্ত্রহীনতার এক ভয়াবহ পরিবেশে এ রাজ্যে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে যে সন্ত্রাস-দুর্নীতি ও দলতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রাজ্যের আপামর জনগণ পথে নেমেছিলেন, তাঁরা আজ প্রতারণার শিকার। এক স্বৈরাচারী শক্তি রাজ্যের ক্ষমতায় বসে একদিকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, রাজ্য কোষাগারের টাকা নিয়ে মোচ্ছব করছে, পারিতোষিক বিতরণ করছে আর অন্যদিকে অবাধ সন্ত্রাস ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ও ব্যক্তিবর্গের কণ্ঠ রোধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। নারীর ওপর নির্যাতন, হিংসা, বলাৎকারের একের পর এক ঘটনায় রাজ্যবাসী যখন স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবলীলাক্রমে ওসব 'সাজানো ঘটনা' 'ষড়যন্ত্র' বলে ঘটনাগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। রাজ্যে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যা করলেন, মুখ্যমন্ত্রী বললেন 'ওরা কৃষক-ই নয়', 'ওদের আমলে কৃষক আত্মহত্যা করেছে'। কতটা অসংবেদনশীল হলে এ ধরণের মন্তব্য করা যায়। গ্রামীণ কর্মহীন মানুষকে যেটুকু কাজ দেওয়ার প্রকল্প ছিল, সেই টাকার অবাধ লুঠ চলছে, আর যারা কাজ করলেন, তাঁরা সময়মত ন্যায্য মজুরি পেলেন না, অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বোঝায় গ্রাম-শহরের গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষ নাজেহাল। দু'একটা বাজার ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী-সান্ত্রীরা বললেন 'এবার দাম কমবে'। গত লোকসভা নির্বাচনে বন্ধ-রুগ্ন কলকারখানা খোলার কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওরা ভোট নিয়েছিলেন, একটাও কারখানা খুললো? নতুন কোন কারখানা হলো? মদের ব্যবসা আর সারদা সহ চিটফাণ্ডগুলোর ব্যবসা ছাড়া রাজ্যবাসী কি পেল? ২৫-৩০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় ৪০ লক্ষ আবেদনকারী, বেকারত্ব কোন্ ভয়াবহতায় পৌঁছেছে। আর শিক্ষক নিযুক্ত হতে গেলে ৪-৫ লাখ টাকা 'ঘুষ' দিতে হবে। এই হচ্ছে 'সততার প্রতীক', তাই আন্না হাজারের 'ফিট সার্টিফিকেট' প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এত কথা, অথচ ভাইপোকে সাংসদ বানাতে মুখ্যমন্ত্রী উঠে-পড়ে লেগেছেন। যুব সমাজের 'এক প্রতিনিধি নায়ক' প্রার্থী তো 'ধর্ষণ'-কে উপভোগ করার কথা বলে জনগণের চাপে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন। অন্য এক সাংসদ ও পূর্বতন মন্ত্রী দমদমে প্রকাশ্য সভায় '৭২ সালের মত ভোট রিগিং-এর পরামর্শ দিলেন—বাংলায় সুবাতাস বইবার এসব নমুনা মাত্র। বীরভূম বা উত্তর ২৪ পরগণায় তৃণমূলী নেতা ও মন্ত্রীরা তো বিরোধীদের কেউটের মত পিটিয়ে মারা বা মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছেন। মুসলিম ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে ওরা বোকা ভাবে—তাই কখনও ৯০ শতাংশ, কখনও ১০০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে বলে প্রতারণা চলছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিগ্রহ, ছাত্র সংসদ দখল নিয়ে যা চললো তাতে '৭২-এর সিদ্ধার্থ রায়ও লজ্জা পাচ্ছেন!

রাজ্যের হাল-হকিকৎ কোথায় এসে দাঁড় করানো হয়েছে বুঝতে পেরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন দিল্লীর 'কিংমেকার' হতে চাইছেন, আর গোপনে গোপনে সমস্ত অশুভ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এ রাজ্যে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য বর্বর-হিংস্র-সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি বিজেপি সক্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে। যে কোন মূল্যে একে প্রতিহত করতে হবে। শ্রমিক-কৃষকের নামে যে মালিক তোষণ, টাটা-সালিমের তোষণ ও কৃষক গণহত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী সোচ্চার হয়েছিলেন, তা কি এই স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার জন্য? বাংলার নির্বাচকমণ্ডলী কখনই বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ও হত্যার রাজনীতির ধারক-বাহকদের ক্ষমা করেননি। তাই জাতীয় স্তরের নির্বাচনেও এ রাজ্যের মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে ফেলে দিতে পারে না। ভারতের বাম-গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল জনগণ ও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আমাদের কেন্দ্রীয় আবেদন ও দাবিসনদ তুলে ধরার পাশাপাশি এ রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আমাদের আবেদন ঃ আমাদের প্রার্থীরা ''পতাকায় তিন তারা'' চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আপনার মূল্যবান ভোট আমরা প্রত্যাশা করি। গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে, অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আপনিও সামিল হন।

রাজ্য দাবিসনদ

১। সন্ত্রাস-দুর্নীতি-দলতন্ত্রমুক্ত বাংলা গড়ে তুলুন

২। উগ্র জ্যাতাভিমান বন্ধ কর, ভ্রাতৃঘাতী হিংসার পরিবেশ গড়ে তুলতে দেব না

৩। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ চাই, ৩০০ টাকা মজুরি চাই, কাজের ৭ দিনের মধ্যে মজুরি চাই সংশোধিত বি পি এল তালিকা প্রকাশ কর

৪। কৃষকদের আত্মহত্যা রোধ কর, মহাজনী প্রথা ও চিটফাণ্ড বন্ধ কর ক্ষুদ্র, গরিব কৃষকদের বিনা সুদে, সহজ শর্তে ঋণ দাও

৫। লাভজনক দরে সরকারকে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল ক্রয় করতে হবে, ফসল সংরক্ষণের জন্য জেলায় জেলায় বহুমুখী হিমঘর চাই।

৬। সার, বীজ কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর, কালোবাজারী-মজুতদারী বন্ধ কর

৭। মহিলাদের ওপর হিংসা, নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির মদতদাতাদের ভোট নয় গণধর্ষণ ও হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনায় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে

৮। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি, কাজের নিরাপত্তা ও মর্যাদা চাই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোকে সম্মানজনক ও জীবন ধারণের উপযোগী করতে হবে

৯। মিছিল-মিটিং-ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না

১০। শিল্পের জমিতে শিল্প চাই, আবাসন নয়, শিল্পের জমি ৩ বছরের বেশি সময় ফেলে রাখা চলবে না

১১। সরকারকে বন্ধ কারখানা ও চা-বাগান খোলার দায়িত্ব নিতে হবে, চা বাগান সহ সমস্ত বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ফাউলাই (বন্ধ মিলের ভাতা) স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বি পি এলের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে

১২। সংখ্যালঘু উন্নয়নে সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী কর

১৩। সিঙ্গুরের কৃষকের জমি চাই, নন্দীগ্রাম গণহত্যার অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চাই

১৪। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও দলতন্ত্র বন্ধ কর, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ কর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ ও দমননীতি বন্ধ কর, অনুদান ও পুরস্কার দিয়ে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা চলবে না

১৫। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের ধোঁকাবাজি বন্ধ কর, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান কর প্যারাটিচারদের স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা ও বেতন দাও

১৬। যৌথ বাহিনী, কালাকানুন প্রত্যাহার করো—সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই

১৭। ৩ একর পর্যন্ত কৃষি কাজে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দাও, গৃহস্থের বিদ্যুতের মূল্য ৫০ শতাংশ কমাতে হবে

১৮। সারদা-টেট-এস এস সি, গোদালা ও পঞ্চায়েত দুর্নীতির উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত চাই, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চাই

১৯। রাজ্যের আদিবাসী প্রধান ব্লকগুলোতে 'পেসা' আইন লাগু কর, পঞ্চায়েত ও গ্রাম সংসদের সম্মতি ছাড়া জমি-জঙ্গল-খনি, প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তান্তর করা চলবে না

২০। চা-বাগান, চটকল, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও অন্যান্য শিল্প সংস্থায় পি এফ-গ্র্যাচুইটি-পেনশনের টাকা তছরূপকারীদের কারাগারে বন্দী কর। শিল্পের জমি বিক্রি করা চলবে না

২১। আক্রান্ত, রক্তাক্ত গণতন্ত্র, প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা বন্ধ কর

কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার মতোই কৃষিমজুরদের বকেয়া মজুরি রাজ্যের জ্বলন্ত দাবি

রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের পাহাড় প্রমাণ বকেয়া ডি এ বা মহার্ঘভাতার কথা সকলেই জানে। কিন্তু ক'জন খবর রাখে রাজ্যের কৃষিমজুরদের প্রাপ্য মজুরির কোটি কোটি টাকা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রেখে দিয়েছে তৃণমূলের 'মা-মাটি-মানুষে'র সরকার। এই রাজ্যের শ্রম দপ্তর অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর ন্যূনতম মজুরির হার ঠিক করে দেয়। সেই তালিকায় একেবারে শুরুতেই আছে কৃষিক্ষেত্র। ১ জানুয়ারি ২০১৪ অর্থাৎ বর্তমান বছরে কৃষিমজুরদের (অদক্ষ) সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির হার নির্দিষ্ট করা আছে ২০৬ টাকা। কৃষি কাজে এই মজুরি কার্যকর হবে কিনা, চাষের বিভিন্ন সিজনে, বিভিন্ন ধরণের কাজে মজুরি কত হবে সেটা গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান, কৃষি উৎপাদনের বাস্তব পরিস্থিতি, শাসক দলের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষিমজুররা সংগঠিতভাবে বর্ধিত মজুরি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে; সংগ্রামী বামপন্থীরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার বহু জায়গায় মজুরি অত্যন্ত কম; শাসকদল তৃণমূল সর্বত্রই মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হল সরকারি কাজে ঐ ২০৬ টাকা মজুরি প্রদান রাজ্য সরকার গ্যারান্টি করবে না কেন? রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে নির্ধারিত মজুরি ১৫২ টাকা। ১ এপ্রিল থেকে হচ্ছে ১৬৯ টাকা। অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজে একজন কৃষিমজুরকে দৈনিক ৫৪ টাকা কম দিয়েছে তৃণমূলের 'গরিব দরদী' সরকার। এই হিসাবে ৩০ দিন কাজ করলে প্রতিটি মজুরের বকেয়া দাঁড়ায় ১৬২০ টাকা। ভোট চাইতে এলে তৃণমূলের নেতাদের কাছে এই বকেয়া টাকার দাবি রাজ্যের কৃষিমজুররা অতি অবশ্যই জোরালো কণ্ঠে তুলে ধরবেন। কৃষি যেহেতু রাজ্য তালিকাভুক্ত, তাই কৃষিক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন। ১০০ দিনের কাজে ঐ রাজ্যের নির্দিষ্ট মজুরি রাজ্য সরকার ঠিক করতে পারে, কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজে মজুরি বাবদ যে টাকা দেয় তার অতিরিক্ত টাকার দায় নিজে বহন করে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা হয়। কোর্ট রায় দেয় যে, ১০০ দিনের কাজে সেই রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত মজুরি রাজ্য সরকারকেই দিতে হবে। কিন্তু এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার তার নিজের তৈরী করা ন্যূনতম মজুরি আইনকে নিজেরাই মানছে না। গ্রামীণ ধনী, নয়া জমিদার শ্রেণী, যারা ১০০ দিনের কাজে তীব্র বিরোধিতা করে এদেরকে তুষ্ট রাখতে বর্ধিত মজুরি থেকে কৃষিমজুরদের বঞ্চিত করছে। ১০০ দিনের টাকায় গ্রামে গ্রামে একপ্রকার 'হরির লুট' চলছে। কৃষিমজুরদের জন্য বরাদ্দ অর্থে তাদের কোন অধিকার নাই; নজরদারি বা তদারকি ব্যবস্থা নাই, সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো, ঠিকাদার, ক্লাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভুয়ো মাস্টাররোল, ব্যাঙ্কের সাথে কারসাজি করে বরাদ্দের ৫০/৬০ ভাগ টাকা আত্মসাৎ করছে। পুকুর বা জলাশয় সংস্কারের কাজে মালিকদের কাছ থেকে শর্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করছে। গ্রামীণ শৌচাগার নির্মাণের নামে ৭০/৮০ ভাগ টাকাই চুরি করা হচ্ছে। আর এসবই তৃণমূলের গোষ্ঠী মাতব্বরি বা রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করার অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট জমানা থেকেই ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির হাজার হাজার ঘটনার অভিযোগ জমা আছে; প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রের একটা বড় অংশ এই দুর্নীতির মদতদাতা। তৃণমূলের তিনবছরের রাজত্বে একজন দুর্নীতিবাজকেও শাস্তি দেওয়া হল না। এভাবে 'পুকুর চুরি' ব্যবস্থাকে সবুজ সংকেত দেওয়া হল।

এছাড়া ১০০ দিনের কাজে দেখা যাচ্ছে তিন/চার মাস, কোথাও বা আরও বেশী সময় হয়ে গেল, কৃষিমজুররা প্রাপ্য মজুরির টাকা পায়নি। অথচ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক ওয়েবসাইট তথ্যে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র যা টাকা দিয়েছে তার ৫১ ভাগ খরচ হয়েছে ৪৯ ভাগ খরচই হয়নি। কেন্দ্র দিয়েছে ২৪৩৩ কোটি টাকা রাজ্য খরচ করতে পেরেছে ১২৪৭ কোটি টাকা। অথচ রাজ্য সরকার বলছে ৮০০ কোটি টাকা

সাতের পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সনদ

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নানান সংসদীয় রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ময়দানে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে হৈ হৈ করে। এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের তামাশা শুরু হয়নি। নানা ঝুঠা প্রতিশ্রুতির বন্যায় জনগণকে পক্ষে টানার প্রচার যুদ্ধ এখনই শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই নির্বাচনী লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণী কীভাবে স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সামনে আসবে নির্দিষ্ট কোন্ রাজনৈতিক সনদকে সামনে রেখে।

বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে আইন প্রণয়নকারী, নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সংসদ—লোকসভা ও রাজ্যসভা—ধনকুবেরদের কুক্ষীগত হয়েছে। কিছুদিন আগে রাজ্যসভার যে ৫৪ জন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, তাঁদের সম্পত্তির গড় পরিমাণ হল ৪৪.৭৪ কোটি টাকা। এঁদের মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছে বিজেপির সাংসদেরা—যাদের সম্পত্তির গড় পরিমাণ ৮৫.৩৬ কোটি। স্বভাবতই, এই সমস্ত ধনকুবেরদের প্রাধান্য বিস্তারকারি সংস্থাগুলোতে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বার্থবাহী নীতিসমূহ আশা করতে পারে না।

এদেশে নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কার চালু হওয়ার পর থেকেই আর্থিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে আছড়ে পড়েছে। চোখ ধাঁধানো, নজীরবিহীন আর্থিক বৃদ্ধি বেলাগাম কর্মহীনতা ডেকে এনেছে। সরকারের তরফে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের সাম্প্রতিকতম তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০১১-১২-র মধ্যে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটেছে ঐ দশকে প্রতি বছর মাত্র ২.২ শতাংশ হারে! আর গত ১৫ বছরে ভারতবর্ষে ধনকুবেরদের সম্পত্তি বেড়েছে ১২ গুণ—যা এদেশের চূড়ান্ত দারিদ্রকে দু-দুবার পুরোপুরি অবসান ঘটাতে পারে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব খাদ্য সূচকের ওপর এক সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। সেই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে অপুষ্টি এবং কম ওজনের শিশুর সংখ্যায় ভারতবর্ষ রয়েছে পয়লা নম্বরে। খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গতি বা তার গুণাগুনের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা ততটা খারাপ না হলেও খাদ্য বণ্টনে চূড়ান্ত ভারসাম্যহীন বা বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যা অনাহার-অর্ধাহারে দিন গুজরান করছে। আর এ প্রশ্নে ভারত রয়েছে বুরুণ্ডি, ইয়েমেন, ম্যাডাগাস্কার ও টিমর লেস্টের সমগোত্রে! খাদ্য সুরক্ষার বহু গালগপ্পো শোনানো হচ্ছে। এদিকে, ২০১২-১৩-র জন্য বরাদ্দ খাদ্য ভর্তুকি ৮৬,৭০৭.৫ কোটি টাকা থেকে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে সামান্য হারে বাড়িয়ে ৯১,৫৭১.৪ কোটি টাকা করা হয়েছে।

কর্পোরেট ঘরানার মুনাফা দিনের পর দিন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আর বিপরীতে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি। বেড়ে চলেছে কাজের বোঝা। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরেই ক্যাজুয়াল, ঠিকা শ্রমিকদের লাগামহীন নিয়োগের ফলে সমস্ত শিল্পের শ্রম বিন্যাসে বড়সড় রদবদল ঘটেছে। স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা নিদারুণভাবে কমে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে ইনফর্মাল কর্মী। যাদের না আছে চাকুরির নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা। অনেক কম মজুরিতে, মধ্যযুগীয় কাজের পরিবেশে যাদের কাজ করে যেতে হয়। শ্রমনিবিড় শিল্পেই শুধু নয়, আজ এই ধরণের কর্মী হু হু করে বাড়ছে সরকারি-বেসরকারি অফিস, সংস্থা, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। অপরদিকে, বেশ কিছু শিল্পের (যেমন ব্যাঙ্ক) অফিসারদের সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের বাইরে নিয়ে আসা হচ্ছে। ইউনিয়নগুলোর পেশ করা দাবি সনদ মীমাংসার ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের চরম ঢিলেঢালা মনোভাব (যেমন এখনও ফয়সালা হল না গতবছর জানুয়ারি মাসে চটশিল্পে পেশ করা নতুন দাবিসনদ), বিরোধ-মীমাংসা আলোচনা পর্বে একতরফা লকআউট/ছাঁটাই প্রভৃতি মালিকী পদক্ষেপ আজ যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর নেমে এসেছে হামলা। ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রকাশ্য হুমকি দিচ্ছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সারা ভারতব্যাপী সরকারি কর্মচারী ও ব্যাঙ্ক শিল্পের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে চরম শ্রমিক বিরোধী অবস্থান নিয়েছে এ রাজ্যের তৃণমূল সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ন। এ রাজ্যে পরিবহণ শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের বিধিবদ্ধ প্রাপ্য থেকে। ধর্মঘট শূন্য-বন্ধ শূন্য রাজ্য হিসাবে 'উত্তরণ' ঘটাতে গিয়ে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের শাসনকালে লকআউটের ফলে শ্রমদিবস নষ্টের পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল ৯৯.৯৭ শতাংশ! এ রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন যে নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের বিরুদ্ধে গত বছর ৪৮ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ভাঙ্গতে রাজ্য সরকার কী নির্মমভাবে নামিয়ে আনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষ ঘাটতিকে মেটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বিলগ্নিকরণ হয়ে উঠেছে বড় একটা হাতিয়ার। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অয়েল এবং ভেল-এর যথাক্রমে ১০ ও ৫ শতাংশ বিলগ্নির ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঐ খাতে রাজকোষে আসবে ৭৩০০ কোটি টাকা। এ রাজ্যেও বেশ কয়েকটি 'রুগ্ন' রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে 'পিপিপি' মডেলে চালাবার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাই, যে সমস্ত দাবির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের স্বাধীন রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হবে তা হল—

- **কর্পোরেট লুণ্ঠনকে মদত দেওয়া নয়া উদারবাদী নীতিসমূহকে প্রত্যাহার করতে হবে।**
- **মহার্ঘ ভাতার সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয় স্তরে মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৫,০০০ টাকা ধার্য করতে হবে।**
- **মহার্ঘ ভাতার সঙ্গে যুক্ত করে মাসিক পেনশন ন্যূনতম ৩,০০০ টাকা করতে হবে।**
- **সমকাজে সমমজুরি এবং কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ।**
- **স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শিক্ষা সহ সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।**
- **বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতিকে অধিকার হিসাবে গণ্য করতে হবে।**
- **মহিলা শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের নির্ভয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সমঅধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।**

- অতনু চক্রবর্তী

নির্বাচনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক সংগ্রাম জোরদার হোক

নির্মাণ শ্রমিকদের উন্নয়নে 'মা-মাটি-মানুষে'র শ্রম দপ্তর অনেক কাজ করছেন এটা সরকারের জোরালো ঘোষণা। বাদবাকি কথাকে ওনারা সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হিসাবে দেখেন। নিজেদের কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বামফ্রন্ট সরকার ২০০৫-০৭ থেকে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত নির্মাণ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করেছিল ২,৭১,৮৭০ জনের। আর তৃণমূল সরকার ২০১১-১৩ সাল পর্যন্ত নির্মাণ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করেছে ৬,৫২,২৫৩ জনকে। প্রকল্প বাবদ আর্থিকভাবে উপকৃত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা বামফ্রন্ট সরকারের ২০০৫-২০১১ সাল পর্যন্ত ৭,৫৯২ জন এবং তৃণমূল আমলে ২০১১-২০১৩ সাল পর্যন্ত ১,৮২,৭০৮ জন। সুতরাং বামফ্রন্ট আমল থেকে তৃণমূল সরকার অনেক বেশী কাজ করছে এরকম একটা দাবি করে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করতে চাইছে।

নির্মাণ শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থার কিছু ছবি তুলে ধরা যাক। রাজা আসে রাজা যায়, নীল জামা-লাল জামা গায়ে—শ্রমিকদের অবস্থা বদলায় না। যেমন—(১) মজুরির প্রশ্নে নির্মাণ শ্রমিকদের ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, অতিদক্ষ-দক্ষ-আধা দক্ষ-অদক্ষ। কাজের ক্ষেত্রে কারা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে ঠিক করা হয় তা বোঝা মুশকিল। আর বাস্তব ক্ষেত্রে দেখি অতি দক্ষ-দক্ষ শ্রমিক কম, অদক্ষ শ্রমিক দলে দলে দেখানো হয়। সরকারি, বে-সরকারি বড় নির্মাণ শিল্প কাজ চলছে যেখানে শত শত নির্মাণ শ্রমিক কাজ করছে সেখানে অতি দক্ষ-দক্ষ শ্রমিকরা ৮ ঘন্টায় ২০০-২৫০ টাকার বেশী মজুরি পায় না। তার প্রধান কারণ কয়েক ধাপের মধ্য শক্তি পেরিয়ে তবে একজন নির্মাণ শ্রমিক হাতে মজুরি পায়। একজন নির্মাণ শ্রমিক সরকার নির্ধারিত (যা চাহিদার চেয়ে অনেক কম, আমাদের দাবি দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা দিতে হবে) ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত করা শ্রম দপ্তরের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকার ও তার শ্রম দপ্তর এ প্রশ্নে নিশ্চুপ।

(২) ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে একদিকে নতুন নতুন ফরমান জারি করা হচ্ছে, অন্যদিকে দলের লোক এবং এন জি ও-দের গ্রামেগঞ্জে নির্মাণ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণে উৎসাহ দিচ্ছেন। ফলে মা-মাটি-মানুষের আমলে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু বড় বড় নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণ শ্রমিকরা নাম নথিভুক্তিকরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ কলকাতা এবং তার আশপাশে যেখানে সবচেয়ে বেশী বড় বড় নির্মাণ কর্মকাণ্ড চলছে, সেখানে মাত্র ৪৫০০/৫০০০-র মত (৯ লক্ষের মধ্যে) নির্মাণ শ্রমিকের সরকারিভাবে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। কলকাতা ও তার আশেপাশে দূরদূরান্তের জেলা থেকে অন্নের সংস্থানের জন্য দলে দলে গ্রামীণ মানুষ নির্মাণ কাজে যুক্ত হচ্ছে। নাম নথিভুক্তিকরণের আজও কোন কেন্দ্রীয় কোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারায় বাংলারই শ্রমিক এক জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে গেল পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, ফলে দলে দলে নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক নথিভুক্তিকরণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অথচ বিহারের মত একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্যে একজন নির্মাণ শ্রমিক বিহার রাজ্যের যে কোন স্থান থেকে নাম নথিভুক্ত করাতে পারে।

(৩) ৩১ মার্চ ২০১৩ সাল পর্যন্ত সারা বাংলায় ১০ লক্ষ টাকার ওপর নির্মাণ প্রকল্পের সংখ্যা দেখিয়েছেন ১৬,৪৩১টি। এই সংখ্যাটি দেখে যে কোন মুর্খ মানুষও হেসে ফেলবে। তারপর মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে নির্মাণ প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন করানো ও তার চাঁদা আদায় ভয়ঙ্করভাবে কমে গেছে।

(৪) শ্রমিক কল্যাণে আর্থিকভাবে উপকৃত নির্মাণ শ্রমিককের সংখ্যা বামফ্রন্টের আমলের চেয়ে বৃদ্ধি করে আপনারা নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটাচ্ছেন। বাস্তব জীবনে ৯ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ১ লাখের কিছু বেশী শ্রমিক উপকৃত হয়েছে। এ প্রশ্নে দিল্লী-মহারাষ্ট্র সহ অনেক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বেশী এগিয়ে আছে। পশ্চিমবাংলা কতটা পেছিয়ে ২/১টি উদাহরণ দিলেই দিনের আলোর মত সামনে চলে আসবে। যেমন টুলস কেনার জন্য মাত্র ২০০০ টাকা, ৯ ভাগের ১ ভাগ মানুষকে দিয়েছেন (১,১৬,৫২৪ জনকে)। সাইকেল দিয়েছেন ৩৮,৫৮৮ জনকে। এটাতে কত শতাংশ শ্রমিক উপকৃত হয়েছে তা বাংলার মানুষ বুঝতে পারছেন। শ্রমিক কল্যাণে প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক অনুদান প্রদানে শ্রম দপ্তরের চরম অবহেলা দেখা যাচ্ছে।

(৫) এলাকা স্তরের লেবার ওয়েলফেয়ার ফেসিলিটেশন সেন্টার বা ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকদের দপ্তরে কোন কাজ হয় না। একজন অফিসার ২/৩টি কেন্দ্রের দায়িত্ব থাকা, কর্মীর অভাবে নীচেরতলার সেন্টারগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে; শ্রমিকরা বারংবার এসে ফিরে যাচ্ছে।

(৬) জেলাভিত্তিক ২/৩টি এ এল সি-তে জেলার সমগ্র নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ কেন্দ্রীভূত থাকা এবং যথেষ্ট সরকারি কর্মচারী না থাকায় শত শত নির্মাণ শ্রমিক নাম নথিভুক্তিকরণের আবেদন জমা দিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। একইভাবে প্রকল্পের আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করেও মাসের পর মাস অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে। এই অরাজকতাকে কাটানোর কোন উদ্যোগ নেই।

এইসমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্ন আছে যা দেখে বোঝা যায় নির্মাণ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্ন আজও অবহেলা করা হচ্ছে।

- কিশোর সরকার

"আজকের দেশব্রতী"
বিশেষ সংখ্যা ২০১৪
এখনও পাওয়া যাচ্ছে
দ্রুত সংগ্রহ করুন
গ্রাহক হোন

পাওয়া যাচ্ছে পুস্তিকা
চারু মজুমদার এবং
তাঁর উত্তরাধিকার
মূল্য ঃ ৩০ টাকা

সংগ্রহ করুন
আজকের দেশব্রতী
প্রকাশিত
কমরেড সরোজ দত্ত
জন্মশতবর্ষ সংখ্যা

কৃষকরা দাবি করছে—সুলভে ঋণ, বিদ্যুৎ ও ফসলের সরকারি ক্রয়

সমগ্র দেশ জুড়েই কৃষি সংকট যেমন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি এই সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনৈতিক নীতি কৃষিক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে এই সংকট ডেকে এনেছে। সরকার কৃষি ক্ষেত্র থেকে নিজের দায় গুটিয়ে নিচ্ছে এবং সমগ্র ক্ষেত্রটি দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই নীতিতে কৃষি ও কৃষকেরা বিপন্নতার মধ্যে পড়েছে এবং বিশেষ করে তা গরিব-মাঝারি কৃষকদের জীবনে দুর্দশা ডেকে এনেছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারও এই একই নীতি নিয়ে চলেছে। চাষের উপকরণ হিসাবে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি এখন বৃহৎ পুঁজির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে এবং তারা মাত্রা ছাড়া হারে এই উপকরণগুলোর দাম বাড়িয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুলও লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, ডিজেলের দামও বাড়ছে। ফলে চাষের জলের খরচও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এদিকে চাষের পুঁজি হিসাবে ব্যাঙ্ক ও সমবায় যা ঋণ দেয় তার বেশীরভাগই হস্তগত করে গ্রামীণ ধনীরা। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং এমনকি মধ্য কৃষকদেরও মহাজনী ও বেসরকারি পুঁজির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং চড়া সুদ গুণতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজির তুলনায় এই মহাজনী ও বেসরকারি পুঁজির পরিমাণ অনেক বেশী। বেসরকারি মতে এটা মোট পুঁজির ৬৫-৭০ শতাংশ। ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের সুদ যেখানে তুলনামূলক কম, সেখানে মহাজনী ও বেসরকারি পুঁজির সুদ কম করে ২০-২৫ শতাংশ। কখনও কখনও তারও বেশী। আবার ধনী কৃষকেরা যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পায়, সেখান থেকেই তারা আবার গরিব কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দেয়। এর ফলে বিঘা প্রতি চাষের খরচ ধনী কৃষকদের তুলনায় গরিব কৃষকদের অনেক বেশী হয়। অপরদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা আবার উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত দামও পান না। মাঠ থেকে ফসল উঠলেই তাদের বিক্রি করতে হয়, আর এই সময়েই বাজারকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে ফসলের বাজার দর কমিয়ে রাখা হয়। তাই উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম দরেই তারা ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নিজেদের শ্রমেরও দাম ওঠে না। এ হল অভাবী বিক্রি। ধনী কৃষকেরা ফসলকে মজুত করে রাখে। বাজারে যখন ফসলের দাম বাড়ে তখনই তারা বিক্রি করে। এই দ্বিমুখী আক্রমণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং মধ্য কৃষকদের ঘাড়েও ঋণের বোঝা বেড়ে চলে। তারা সর্বস্বান্ত হয়, ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ২০০২ সালের জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে ৫৩ শতাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত। আজ কৃষি সংকটের সময়কালে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের শতাংশ অনেক অনেক বেশী।

নয়া আর্থিক নীতির ফলে দেশে ৩ লক্ষের বেশী কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের শেষ দিক থেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা শুরু হয়ে যায়। তৃণমূল শাসনের সময়কালেই তা মারাত্মক আকার নেয়। এই রাজ্যে এ পর্যন্ত ৮৪ জন কৃষকের ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। কৃষক আত্মহত্যা রোখার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন কার্যকরি পদক্ষেপ করেনি, তৃণমূল সরকারও করছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তো কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা স্বীকারই করেন না। পরিবর্তনের ঢাক পিটিয়ে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রকাশ করে তাতে রয়েছে কর্পোরেটদের হাত ধরে কৃষির আধুনিকীকরণের কথা, যার গ্রামীণ ভিত্তি হল ধনী কৃষক। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মধ্য কৃষক, তাদের স্বার্থে কোন কথাই নেই। অথচ এই কৃষকেরা সুলভে সার, বীজ, কীটনাশক ও চাষের জল পাওয়ার দাবি করে আসছেন ও আন্দোলনেও নেমেছেন। সুলভে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার দাবি কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি। **আজ এই সংকটের সময়কালের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তি গরিব কৃষকরা যাতে বিনা সুদে সরকারি ঋণ পায় তার দাবি আমরা তুলে ধরছি।** কৃষকেরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারে তার জন্যও তৃণমূল সরকারের কোন কার্যকরি পদক্ষেপ নেই। সরকারের দ্বারা কৃষকদের থেকে ধান কেনার রেকর্ড বেশ খারাপ। গত বছর '১২-'১৩ সালে সরকারি চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২২ লক্ষ মেট্রিক টন থাকলেও সরকার তার অনেক কমই সংগ্রহ করেছে। তদুপরি যা সংগ্রহ হয়েছে তার বেশিরভাগ অংশই চাল কল মালিকদের থেকে কেনা, কৃষকদের থেকে কেনা নয়। এ বছরেও '১৩-'১৪ সালে যা লক্ষ্যমাত্রা তার ৮ শতাংশও সংগ্রহ হয়নি। এ হল গরিব কৃষকদের প্রতি সরকারের চরম বেদরদী মনোভাব। কেন্দ্রীয় সরকার ধানের সহায়ক মূল্য স্থির করে। এতে উৎপাদন খরচও ওঠে না। তাই বিভিন্ন রাজ্য সরকার এর উপরে কুইন্টাল প্রতি হিসাবে অতিরিক্ত বোনাস দেয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যা কুইন্টাল প্রতি যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ১০০ টাকা বোনাস দিয়েছে। এ বিষয়েও তৃণমূল সরকার উদাসীন। আসলে কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য কেনার জন্য তৃণমূল সরকারের সদিচ্ছা এবং যথাযথ কোন ব্যবস্থাই নেই। শুধু ধানের ক্ষেত্রেই নয়, পাট, আলুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আলুর বাজার দর পড়ে যাওয়ার কারণে ২০১১ সালে কৃষকেরা হিমঘরে রাখা আলু হিমঘরেই ফেলে রাখে। বাজার নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে মার খায় গরিব ও মাঝারি কৃষকরা। **কৃষকদের কাছ থেকে লাভজনক দরে ফসল কেনার দাবি হল সরকারের কাছে কৃষকদের এক জ্বলন্ত দাবি।** এই দাবিতেই গরিব কৃষকরা ও আমাদের সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে তৃণমূল সরকারের আমলেই বিদ্যুতের মাশুলের হার মাত্রাছাড়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের শরিক ছিল তখনই লাফ দিয়ে দিয়ে ডিজেলের দাম বাড়ে, পেট্রোলের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন তৃণমূল কংগ্রেস কোন প্রতিবাদই করেনি। আর এখন 'কৃষক দরদী' তৃণমূল সরকার পেট্রোল, ডিজেল থেকে রাজ্য সরকারের 'সেস' পুরো মাত্রায় তুলে নিচ্ছে। কৃষকেরা বিশেষ করে গরিব কৃষকেরা যাতে কম দামে চাষের জল পেতে পারে তাই আমরা **৩ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি তুলেছি।**

এ সবই হল ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের অতি আশু দাবি। এগুলো আজ কৃষকদের মরা-বাঁচার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই দাবিগুলোর প্রতি রাজ্য সরকার হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস ইতিবাচক পদক্ষেপ করতেই পারে, তার জন্য কেন্দ্রের দিকে আঙুল তোলার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। কিন্তু 'কৃষক দরদী' তৃণমূল সরকার এ সমস্ত প্রশ্ন কানেই তোলে না।

কৃষকদের এই সমস্ত দাবিগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য, দেশী-বিদেশী পুঁজির কব্জা থেকে কৃষি ও কৃষকদের মুক্ত করার জন্য, গরিব ও মাঝারি কৃষকদের ওপর ভিত্তি করে এক প্রাণবন্ত কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন **নয়া অর্থনৈতিক নীতিকে বদল করা। এই নীতি বদলের শ্লোগান আজ মুখ্য রাজনৈতিক শ্লোগান হয়ে উঠেছে, সি পি আই (এম এল) এই শ্লোগান নিয়েই এগিয়ে চলেছে।**

- কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল)
হিন্দমোটর-কোন্নগর ১৭তম আঞ্চলিক সম্মেলন

২ মার্চ কোতরং বাজার সংলগ্ন 'মা লক্ষ্মী ভিলা'য় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পার্টির ১৭তম হিন্দমোটর-কোন্নগর আঞ্চলিক সম্মেলন। মাইক প্রচার বন্ধ থাকায় কয়েক হাজার লিফলেট-পোস্টার, দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে ভালোমাত্রায় প্রচার সংগঠিত করা হয়।

সদ্য প্রয়াত জেলার প্রবীণ নেতা কমরেড ব্যোমকেশ ব্যানার্জীর নামে সম্মেলন স্থলের নামকরণ করা হয়। প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেলা পর্যবেক্ষক স্বপন গুহ-র পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার মত গতিশীল পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। শ্রমজীবী মানুষেরা খুব দ্রুতই উপলব্ধি করছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আসল চরিত্র। তাই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান গড়ে তোলার আহ্বান রাখা হয় সম্মেলন থেকে।

সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার। অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে তিনি শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ছাত্র-যুব, শিক্ষক এঁদের মধ্যে পার্টির বার্তাকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন।

সবশেষে ১৩ জনের আঞ্চলিক কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত আঞ্চলিক কমিটি অপূর্ব ঘোষকে সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করে।

কৃষিমজুরদের বকেয়া মজুরি ... জ্বলন্ত দাবি

পাঁচের পাতার পর

নাকি কেন্দ্রের কাছে বকেয়া! এভাবে তথ্যের মারপ্যাচ, কেন্দ্র-রাজ্য চাপান-উতোরের চালাকির মাধ্যমে কৃষিমজুরদের কাজ করার পর মজুরি দেওয়া হচ্ছে না।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজ গুটিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'কুমীর ছানা' দেখানোর মতো করে 'খাদ্য সুরক্ষা'র গল্প শোনানো হচ্ছে, যাতে চলতি রেশন ব্যবস্থার যৎসামান্য বরাদ্দ খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণটুকুকেও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যে নতুন করে বি পি এল তালিকা প্রকাশ করবে। বিভিন্ন ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠকে জানানো হয়েছিল এ বছর জানুয়ারি মাসে সংশোধিত বি পি এল তালিকা প্রকাশ করা হবে, কিন্তু সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে গরিবদের ছিঁটেফোটা সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত করেছে তৃণমূল সরকার। অথচ বিভিন্ন জায়গায় চটকদারি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন '২০০ দিনের কাজ দেওয়া হবে'। তাই মূল্যবৃদ্ধির আগুনে যখন কৃষিমজুররা দগ্ধ হচ্ছেন, তখন কাজের অভাবে ভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়ে, গ্রাম থেকে শহরে গঞ্জে এসে চরম অমর্যাদা ও অনিশ্চিয়তার মধ্যে তাদের দিন গুজরান করতে হচ্ছে। এ বছর কৃষি সংকটের কারণে চাষের জমির পরিমাণ কমে গেছে, ফলে কৃষি কাজও কমে গেছে! স্বাস্থ্য-শিক্ষা-একটু ভদ্রস্থ জীবনযাপনের সুযোগ তাদের সামনে নাই; তখন গ্রামবাংলার কৃষিমজুররা তাদের শ্রমের মর্যাদার দাবি তুলে ধরছেন—"২০০ দিনের কাজ, ৩০০ টাকা মজুরি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অতি অবশ্যই গ্যারান্টি করতে হবে"। কাজের ৭ দিনের মধ্যে মজুরি দিতে হবে।

- জয়তু দেশমুখ

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুকদেব-এর শহীদ দিবস পালন

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুকদেব-এর ৮৩তম শহীদ দিবসে গত ২৩ মার্চ বাঁশদ্রোণী এলাকায় (১১২ ও ১১৩ নং ওয়ার্ড, মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশন সংলগ্ন স্থান) শহীদ স্মরণ কর্মসূচী নেওয়া হয়। লাল পতাকা অর্ধনমিত রেখে শ্লোগান ওঠে শহীদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ! কর্পোরেট ফ্যাসিবাদ দূর হটো! পুঁজিবাদ নিপাত যাক! শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন স্বপন রায়চৌধুরী, সুজয় ভদ্র সহ অন্যান্য পার্টি কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। ভগৎ সিং-এর রচনা পাঠ করেন রাজীব গুহ। সবশেষে ''আজকের দেশব্রতী'' বিক্রি করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এই কর্মসূচী পথচলতি মানুষ ও এলাকার মানুষের মধ্যে ভাল প্রভাব ফেলে।

কমরেড আশু মজুমদার স্মরণ কর্মসূচী

গত ১০ মার্চ যাদবপুর-ঢাকুরিয়া এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কমরেড আশু মজুমদার স্মরণে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও মিছিল সংগঠিত হয়। সকালে গড়ফা মোড়, পালবাজার এবং শহীদনগর পার্টি অফিসে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক বাবুন চ্যাটার্জী, জেলা সদস্য অমিত দাশগুপ্ত, অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী, এরিয়া সদস্য সুশান্ত দেবনাথ, মলিনা বক্সী, নান্টু হোড়, তপন বিশ্বাস প্রমুখ। বিকালে '৭০ দশকের গণহত্যার তদন্ত ও বিচারের দাবিতে, আশু মজুমদারের আত্মবলিদানকে লাল সেলাম জানিয়ে এক দৃপ্ত মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে আশু মজুমদার প্রতিষ্ঠিত রিক্সা ভ্যানচালক ইউনিয়নের মেহনতী মানুষেরাও অংশগ্রহণ করেন।

ঘটনা ও প্রবণতা

গুজরাটে মোদী জমানায় বেকারের সংখ্যা কমছে না

সম্প্রতি গুজরাট সরকারের চাকুরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য, রাজ্যের উন্নতির দাবিকেই নস্যাৎ করেছে। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী গুজরাটে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৮.৯৯ লক্ষ। তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল ৮.৭৯ লক্ষ। ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯১ লক্ষ। গুজরাট রাজ্যে ১৯৯০ সালে নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫.৯৩ লক্ষ এবং অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৩.৬৩ লক্ষ। মোট ৯.৫৬ লক্ষ। ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৯.১২ লক্ষ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার মিলিয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা একই থাকছে।

— দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৫ মার্চ ২০১৪

এম সি আই পরিদর্শনে রাজ্যের সিংহভাগ কলেজই 'ফেল'

আসন বাড়ানো বা নতুন পাঠ্যক্রম চালু করা—এই দুটি হল 'সরকারিভাবে' মেডিকেল শিক্ষার কোনও রাজ্যের অগ্রগতির অন্যতম দুই সূচক। আর এই দুই ক্ষেত্রেই ডাক্তারির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার (এম সি আই) চোখে রাজ্যজুড়ে একের পর এক মেডিকেল কলেজ 'ফেল' করল। কিছুদিন আগে এই ব্যাপারে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লজ্জার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, কল্যাণী মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, বি সি রায় শিশু হাসপাতাল—কমবেশি একই দোষে দুষ্ট সকলেই। যাদবপুরে রাজ্যের অন্যতম বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অবস্থাও মোটেই ভালো নয়। এম সি আই জানিয়েছে, এই রাজ্যের বেশ কয়েকটি কলেজে অবৈধ ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করছেন বহু শিক্ষক। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও ফুলবাগানের বি সি রায় শিশু হাসপাতাল। এছাড়া আবেদন বাতিলের কারণ হিসাবে শিক্ষক ও কর্মীর অভাব, যন্ত্র না থাকা, অপরিচ্ছন্নতা, ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের উপাদান পৃথকীকরণের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি তুলে ধরেছে তারা।

— বর্তমান, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয় ঃ দিল্লির পর কলকাতা

মহিলাদের চলাফেরার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয় রাজধানী শহর দিল্লি। দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য সবথেকে নিরাপত্তাহীন শহরের আখ্যা পেয়েছে রাজধানী। ২০১৩ সালের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজধানীর মাথায় একই পালক যুক্ত হল। দিল্লির পরই উঠে এসেছে কলকাতার নাম।

ট্রিপ অ্যাডভাইজার নামে একটি সংস্থা দেশের প্রধান ১০টি শহরে সমীক্ষা চালিয়ে দিল্লিকে প্রথম স্থান দিয়েছে। শহরের ৯৫ শতাংশ মহিলা মনে করেন তাঁদের চলাচলের পক্ষে দিল্লি নিরাপদ নয়। অন্যদিকে কলকাতার ৬৪ শতাংশ মহিলা তাঁদের শহর নিরাপদ নয় বলে মনে করেন। দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহরের আখ্যা পেয়েছে আমেদাবাদ। পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাণিজ্যনগরী মুম্বই। সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার কারণে মহিলারা একাকী ভ্রমণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।

— বর্তমান, ৭ মার্চ ২০১৪

৬৮ কোটি ভারতবাসীর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটে না

ম্যাকেন্সি গ্লোবাল ইন্সটিটিউটের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ভারতের ৬৮ কোটি জনসংখ্যার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনই মেটে না। শতাংশের হিসেবে সংখ্যাটা ৫৬, অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী।

অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বলতে বোঝায় খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, বাসস্থান, পরিধান, জ্বালানী, জীবানুমুক্ত টয়লেট, সামাজিক সুরক্ষা—এই নয়টি প্রাথমিক নিরাপত্তা।

ম্যাকেন্সি গ্লোবাল ইন্সটিটিউট (MGI) এবং পরিকল্পনা (প্ল্যানিং) কমিশন (P C)-এর দেওয়া তুলনামূলক তথ্য নীচের সারণীতে দেওয়া হল।

	MGI টাকা	P C টাকা
শহুরে দারিদ্র রেখা	১,৬৯২	১,০০০
শহুরে দারিদ্র (শতাংশে)	৪৪	২৫.৭
গ্রামীণ দারিদ্র রেখা	১,২২৮	৮১৬
গ্রামীণ দারিদ্র (শতাংশে)	৬১	১৩.৭

	MGI টাকা	P C টাকা
মোট দারিদ্র (শতাংশে)	৫৬	২১.৯
মোট দারিদ্র্যের সংখ্যা	৬৮ কোটি	৩২.৫ কোটি

— দি হিন্দু, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

আজকের দেশব্রতী সংবাদপত্রের মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত বিবৃতি
ফর্ম ৪ (ধারা-৮)

১।	প্রকাশন স্থান	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
২।	প্রকাশকাল	সাপ্তাহিক
৩।	মুদ্রক	কার্তিক পাল
	ভারতের নাগরিক কি না	হ্যাঁ
	ঠিকানা	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
৫।	সম্পাদক	অনিমেষ চক্রবর্তী
	ভারতের নাগরিক কি না	হ্যাঁ
	ঠিকানা	২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
৬।	যাঁরা পত্রিকার মালিক এবং মোট পুঁজির ১ শতাংশের বেশী অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) ২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০০১৪

আমি কার্তিক পাল এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলো আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(কার্তিক পাল)
প্রকাশকের স্বাক্ষর

সি পি আই (এম এল) বেহালা আঞ্চলিক সম্মেলন

গত ২৩ মার্চ বেহালার রবীন্দ্রনগরে ক্ষেত্রমোহন স্কুলে সি পি আই (এম এল)-এর ১৯তম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত কমরেড কিশোরী গায়েন ও কমরেড প্রণব বিশ্বাসের নামে যথাক্রমে সভাগৃহ ও মঞ্চ উৎসর্গীকৃত করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান কমরেড পরিতোষ ভট্টাচার্য। এরপর নদীয়ার কমরেড ইউসুফ মোল্লা সহ ভারতবর্ষের বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে মাল্যদান পর্ব শুরু হয়। মাল্যদান করেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, রাজ্য কমিটির সদস্য নবকুমার বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী দত্ত, কলকাতা জেলা সদস্য চন্দ্রাস্মীতা চৌধুরী, পরিতোষ ভট্টাচার্য ও আঞ্চলিক সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্য, শুক্লা সেন প্রমুখ। ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ শহীদ ভগৎ সিং-এর মৃত্যু বার্ষিকীকে স্মরণ করে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। নবকুমার বিশ্বাস ভগৎ সিং-এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও মার্কসবাদের প্রতি তাঁর অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়।

মিথিলেশ সিং, পরিতোষ ভট্টাচার্য ও শুক্লা সেনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলনের শুরুতে জেলা পর্যবেক্ষক ইন্দ্রাণী দত্তের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সবশেষে আঞ্চলিক সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন।

জেলা কমিটির সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী বলেন, বর্তমান রাজ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে সাহসের সাথে প্রতিকুল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে পূর্ব বেহালায় পার্টি কাজের যে গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে তার ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে পশ্চিম বেহালায় স্থিতাবস্থা ভাঙতে হবে। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক এই সম্মেলনকে বানচাল করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য কমরেডদের ও স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অভিনন্দন জানান। সম্মেলন শেষে ১৩ জনের বেহালা আঞ্চলিক কমিটি নির্বাচিত হয় এবং সৈকত ভট্টাচার্য সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত হন।

... ঝাড়খণ্ডে জনবিকল্প জনসমাবেশ

তিনের পাতার পর

শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এই জনবিকল্প র‍্যালির মধ্যে দিয়ে সারা ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে জোরালো বার্তা দিয়েছেন যে, তাদের চক্রান্তকে কখনই সফল হতে দেওয়া হবে না। নির্বাচনী ফায়দার জন্যই মুজফফরনগরে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে এসে দারিদ্রকে কটাক্ষ করে বলে গিয়েছেন, ''বিজেপিকে একটা সুযোগ দিন, আমরা ঝাড়খণ্ডকে সমৃদ্ধ করে তুলব।'' কিন্তু তিনি অবলীলায় ভুলে যান যে, ঝাড়খণ্ডে প্রথম সরকার বিজেপিই গঠন করেছিল এবং তারা ৯ বছর ধরে ঝাড়খণ্ড শাসন করেছে, কিন্তু ঝাড়খণ্ডে একটুও সমৃদ্ধি আসেনি। অনেক জায়গাতেই কংগ্রেসের লাগানো হোর্ডিং-এ লেখা থাকছে, ''আমরা জমি অধিগ্রহণ আইন বানিয়েছি।'' কিন্তু এই জমি অধিগ্রহণ আইন কৃষকদের জন্য নয়, বড় বড় এবং শক্তিশালী কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে সুবিধা দিতেই ঐ জমি অধিগ্রহণ আইন বানানো হয়েছে! কৃষকদের জন্যই যদি ঐ আইন বানানো হয়ে থাকে তাহলে ফেরেদারাই-এ কৃষকদের ওপর গুলি চালানো হল কেন?

হেমন্ত সোরেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের অধীনে ফেরেদারাইয়ে গুলি চলেছে; আর বাবুলাল মারাণ্ডি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় গুলি চলে ডোরাণ্ডায়। কমরেড দীপঙ্কর জোরের সাথে বলেন, ধনীদের স্বার্থরক্ষাকারী নীতিগুলোকে পাল্টাতে হবে। যে নীতিগুলো মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় এবং দুর্নীতির জন্ম দেয়, কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে বিপুল লাভ এনে দেয়, সেই নীতিগুলোকে বাতিল করে দেশের জন্য প্রয়োজন নতুন নীতি।

দীপঙ্কর আরও বলেন, দেশের চিন্তাধারা পাল্টাচ্ছে। উন্নয়নের নিদর্শন হিসেবে কংগ্রেস বলছে—দিল্লীতে মেট্রো চলছে। এই ধরণের উন্নয়নের ভিত্তিতেই এর আগে ভোট চাওয়া হত। কিন্তু এখন নির্বাচনের ইস্যু হয়ে উঠছে জল, বিদ্যুৎ ও ঠিকা কর্মীদের নিয়মিতকরণের মত বিষয়গুলো। এই সমস্ত ইস্যুগুলোকে ধরেই এক নতুন দল উঠে এসেছে। ২০১৪-র নির্বাচনেও ইস্যু হবে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদকে রক্ষা করা, জল-জমি-জঙ্গলকে রক্ষা করার মত বিষয়গুলো। এই জন্যই আমরা শ্লোগান দিয়েছি—''বদলাও নীতি বদলাও রাজ, সংসদে উঠুক জনতার আওয়াজ'', ''দাম বাঁধো কাজ দাও, কাজের পুরো টাকা দাও''।

নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে কর্পোরেট ঘরানাগুলো একজোট হয়েছে বলেও দীপঙ্কর মন্তব্য করেন। আগে টাটা-বিড়লাদেরই কর্তৃত্ব ছিল, এখন জিন্দাল, মিত্তাল, আম্বানি ও অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থাগুলো জল-জঙ্গল-জমিকে কব্জা করছে। সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণ পুঁজিপতিদের মুখের মত জবাব দেবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ছিল—অনায়াসে বিকল্পকে পাওয়া যাবে না। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা খোয়ানো নেতৃবৃন্দ এবং প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়া দলগুলোর হাত ধরেও বিকল্প আসছে না। যুবক, জনজাতি, শ্রমিকশ্রেণী এবং দেশের সমস্ত ন্যায়প্রেমী জনগণের ঐক্যের মধ্যে দিয়েই বিকল্প গড়ে উঠবে।

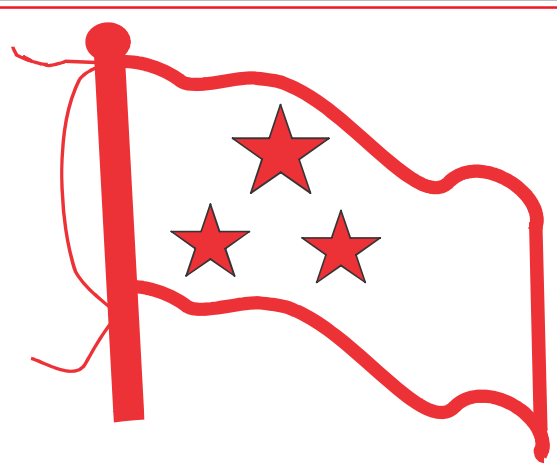

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com